বলি ও মাংসাহার– শক্তি সাধকরা কী বলেন ?

ডঃ গৌতমকুমার পাল
(অধ্যাপক, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট, কলিকাতা)।

মহাষ্টমীর শেষ চব্বিশ মিনিট এবং মহানবনীর প্রথম চব্বিশ মিনিট- এই আটচল্লিশ মিনিটকে সন্ধিপূজার সময় ধরা হয়। এই সময় দুর্গাকে চামুন্ডারূপে পুজো করা হয় এবং অনেক স্থানেই পশুবলির আয়োজন করা হয়। কালীপুজোতেও অনেকে ছাগবলির ব্যবস্থা করে এবং সেই মাংস পেঁয়াজ-রসুন ছাড়া রান্না করে 'মায়ের প্রসাদ'রূপে উপভোগ করে।

অথচ ভগবানের সঙ্গে ভক্তের সম্পর্ক ভলোবাসার এবং 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।" এই তত্ত্ব অনুধাবন করলে পশুবলি বা 'নিরামিষ' মৎস-মাংসরুপ 'প্রসাদ'-কে কোনওভাবেই সমর্থন করা যায় না। 'প্রসাদ' এর অর্থ কৃপা, মর্মার্থ ভগবৎকৃপা, যেখানে হিংসার কোনও স্থান নেই।

বেলুড় মঠে ১৯০১ সালে যখন প্রথম দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়, স্বামী বিবেকানন্দ তখন বলি চালু করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সারদাদেবী মায়ের সামনে সন্তানের হত্যা মেনে নিতে পারেননি। বিবেকানন্দ সারদাদেবীর আদেশ মাথা পেতে নিয়েছিলেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে নিরামিশাষী ছিলেন। বেনিয়াটোলা - নিবাসী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অধর সেন যখন প্রথমবার তাঁকে দর্শন করতে আসেন, তিনি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেন, "বলিদান করা কি ভাল ? এতে তো জীবহিংসা করা হয়"।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "বিশেষ বিশেষ অবস্থায় শাস্ত্রে আছে, বলি দেওয়া যেতে পারে। .... কিন্তু সকল অবস্থাতে হয় না।" তিনি আরও বলেন যে দাঁড়িয়ে বলি তিনি দেখতে পারেন না। কেও মার প্রসাদী মাংস হিসেবে তাঁকে দিলে , তিনি সেটা কপালে ঠেকাতেন, কিন্তু খেতেন না। (কথামৃত, পঞ্চমভাগ, চতুর্থ খন্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

স্বামী বিবেকানন্দ নিজে আমিশাষী হয়েও বলেছেন "All liking for fish and meat disappears when pure Sattva is highly developed , and these are the signs of its manifestation in a soul: sacrifice of everything for others, perfect non-attachment to lust and egotism. The desire for animal food goes away when these things are seen in a man" (Complete Works 5.403)

কথামৃতের এক জায়গায় (দ্বিতীয় ভাগ, সপ্তম খন্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ) ঠাকুর মাস্টারকে বলেছেন-"কখনও দক্ষিনেশ্বরে সাবর্ন চৌধুরীদের বাড়ীতে যেতুম। তাদের বাড়ী খেতুম বটে, কিন্তু ভাল লাগতো না; কেন আঁস্টে গন্ধ !"

১৮৯৪ সালের ১ লা মে স্বামী বিবেকানন্দ নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন নিউ ইয়র্কের সেন্ট ডেনিস

হোটেলে 'ভি' (V=Vegetarian) ক্লাবের নৈশভোজে। তিনি মন্তব্য করেন-

ভারতবর্ষের তিন -চতুর্থাংশ মানুষ নিরামিশাষী, কারন তাঁরা পশু পক্ষীদের প্রতি এতটাই সদয় যে খাদ্যের জন্য তাদের হত্যা করেন না। তিনি আরও বলেন "In this country when animals are injured, it is the custom to kill them. In India it is the rule to send them to a hospital. In approaching Bombay, the first thing the traveler comes across is a very large hospital for animals. This has been the practice for 4,000 years"[The New York Daily Times, May 2, 1894]

১৮৯৪ সালে চিকাগোতে ভক্তিযোগ বিষয়ক ছয়টি ভাষণের প্রথমটিতে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন [Complete Works, Volume 4]- "জীবহত্যা করে তবেই আমরা মাংস পাই। আমাদের ক্ষনেকের সুখ ও তৃপ্তি সাধনের জন্য অন্য একটি জীবকে এক্ষেত্রে প্রাণ দিতে হয়। শুধু তাই নয়, মাংসাহারের ফলে আমরা অন্য মানুষদেরও চরিত্রভ্রষ্ট করে থাকি। মাংসাহারকারী যদি নিজের হাতে প্রানীটিকে হত্যা করতে পারে সেও বরং ভাল। কিন্তু তার পরিবর্তে দেখা যায় সমাজের মধ্যে প্রানীহত্যাকারী একটি বিশেষ শ্রেণীই গড়ে উঠেছে যারা এই প্রানী হত্যাকেই ব্যবসা বা জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছে। আর মজার ব্যাপার হল এই জীবিকার জন্য সমাজের কাছেও তারা হয়ে ওঠে ঘৃনার্বহ। ইংল্যাণ্ডে এরকম নিয়ম আছে যে একজন কশাই কখনো বিচারালয়ের জুরি হতে পারে না। তার কারণ কশাইরা স্বভাবতই হয় নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু কশাইকে নিষ্ঠুর করে তুলেছে কে? করেছে সমাজই। আমরা যদি মেষ বা গোমাংস আহার না করতাম তাহলে এই কশাই শ্রেণীর সৃষ্টি হত না"।

আমরা এ প্রবন্ধের প্রথমাংশে রামকৃষ্ণকে উদ্ধৃত করে বলেছি- বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বলি দেওয়ার কথা শাস্ত্রে বলা আছে। কী সেই বিশেষ অবস্থা? স্কন্দ পুরানে অবর্ণিত আছে (বাসুদেব মাহাত্ম্য) যে ত্রেতাযুগে এ ধরণীতে এক মহাদুর্ভিক্ষ নেমে আসে। তখন সাধারণ মানুষ প্রাণধারনের জন্য বাধ্য হয়ে প্রাণীহত্যা আরম্ভ করে। মুনি - ঋষিরা তখন নিদান দেন যে এরুপ শস্যখাদ্যহীন অসহায় অবস্থায় যদি আত্মরক্ষার জন্য প্রানীহত্যা করতেই হয়, তাহলে যজ্ঞের মাধ্যমে তাকে উৎসর্গ করে যেন তাকে গ্রহণ করা হয়। একেই বলি বলে। শুধুমাত্র জিহ্বার তৃপ্তির জন্য প্রানীহত্যা বৈদিক শাস্ত্রে সামগ্রিকভাবে নিষিদ্ধ।

কোনও কোনও গ্রন্থে ক্ষত্রিয়দের দ্বারা অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা বর্নিত আছে- কিন্তু সে অশ্বের মাংস খাওয়া হত না। যজ্ঞাহুতির অব্যবহিত পরেই মন্ত্রবলে মৃত অশ্বটিকে পুনর্জীবিত করা হত। এহেন মন্ত্র-পারদর্শী যজ্ঞকারীর অস্তিত্ব যখন আজকের সমাজে নেই, তখন এহেন যজ্ঞের উল্লেখ করে সেই অজুহাতে পশুবলিও আজকের যুগে অনভিপ্রেত। বহ্মবৈর্বত পুরাণেও কলিযুগে এরুপ বলি করতে নিষেধ করা আছে।

আজকের যুগে বলি যদি দিতেই হয়, তবে যেন আমাদের ভিতরের পাশবিক প্রবৃত্তিগুলির বলি দেওয়া হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ,মোহ, মদ ও সাৎসর্য -এই ছয়টি পশু আমাদের মনের অরণ্যে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। আমরা মা দুর্গার সন্ধিপূজায় বা মা কালীর আরাধনায় যেন এই পশুদের বলি দিতে পারি মায়ের রাঙা পায়।

মায়ের জ্ঞান-খড়্গে নিধন হোক অজ্ঞান-রূপী অন্ধকারের, অন্তরে জ্বলে উঠুক ভালোবাসার প্রদীপ । তবেই সার্থক দীপাবলি উৎসব। সাধক রামপ্রসাদকে স্মরণ করে বলতে পারি-

"অহঙ্কার অবিদ্যা তোর পিতামাতায় তাড়িয়ে দিবি।
যদি মোহগর্তে টেনে লয়, ধৈর্য খোঁটা ধরে রবি।
ধর্মাধর্ম দুটো অজা, তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ, তবে জ্ঞান খড়্গে বলি দিবি।